১.২. ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ (Origin and Development of Religion)

'ধর্ম' বলতে সাধারণভাবে বোঝায়, কোন অতিপ্রাকৃত সত্তায় মানুষের বিশ্বাস এবং ঐ অতিপ্রাকৃত সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অথবা তার সঙ্গে একাত্মতালাভের জন্য পূজা, অর্চনা, আরাধনা ইত্যাদি কর্মানুষ্ঠান। ধার্মিক ব্যক্তিরা ঐ অতিপ্রাকৃত সত্তাকে 'ঈশ্বর' নামে চিহ্নিত করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর বাস্তবিক আছেন এবং এই জীব-অধ্যুষিত জগৎকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ও সম্প্রসারণের ফলে পণ্ডিত মহল ভিন্ন অভিমত পোষণ করে বলেন, **ধর্মের ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেননি, মানুষই তার ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে— ঈশ্বর প্রকল্প মানুষেরই রচনা।** ঈশ্বর একটা প্রত্যয়মাত্র, মানুষের কল্পনাকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। 'মানুষের এই ঈশ্বর-কল্পনাটি সনাতন বা শাশ্বত নয়, মানুষের আর্বিভাবের আগে ঈশ্বর-প্রত্যয় ছিল না, মানুষের অস্তিত্ব-কাল পর্যন্ত ঈশ্বর-প্রত্যয়টি এক কল্পনার বিষয় হয়ে টিকে থাকবে। মহাবিশ্বের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের (সূর্য) এক অতি নগণ্য গ্রহে অনতিকাল পূর্বে* আবির্ভূত 'মানুষ' নামক এক জীব ঐ অনিত্য প্রত্যয়টি গঠন করেছে। ধর্মের ঈশ্বর তাই জগৎস্রষ্টা এবং জগৎপালক নয় — অনন্ত দেশ-কালের অতি ক্ষুদ্র এক প্রান্তের ক্ষণস্থায়ী মানুষের ক্ষণস্থায়ী কল্পনার বদ্‌বুদমাত্র।'[১]

মানুষের স্বভাবের মধ্যেই ধর্মীয় ভাব নিহিত ছিল। ধর্মের মূল তাই মানুষের স্বভাবে, বাইরে নয়। মানুষ যখন একান্ত অসহায় বোধ করে, চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়, যখন তার নিজ শক্তিতে জীবনযাপন সম্ভব বলে মনে হয় না, তখন সেই দুর্বল মুহূর্তে সে তার স্বভাববশেই বাইরের সাহায্য কামনা করে। আদিম মানুষ একইভাবে তার বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত জীবনে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার অভিপ্রায়ে, বাইরের অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করেছে। মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হল — 'জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা' —এই জৈবিক প্রয়োজন থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। আদিম মানুষের জীবন ছিল নানাভাবে বিপর্যস্ত — প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন বিপন্ন, বন্য হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে জীবন বিপন্ন। নিজের সীমিত ও ক্ষুদ্র শক্তিতে এইসব বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় ক'রে আত্মরক্ষা প্রায় অসম্ভব মনে হওয়ার মানুষ তার সেই অসহায় মুহূর্তে বাইরে থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে এবং শক্তিধর প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনার পশ্চাতে অতিমানবীয় সত্তার কল্পনা ক'রে পূজা অর্চনা আরাধনা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ কল্পিত শক্তির কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবেই আদিম মানবসমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'ফেটিস্ পূজাবাদ' (fetishism) 'প্রাণবাদ' (Animism), 'প্রেতপূজাবাদ' (Ghost-worship doctrine) 'টোটেমবাদ' (Totemism)

ইত্যাদির প্রচলন হয়। এভাবেই আদিম মানবসমাজে **'গোষ্ঠীধর্মের'** (Tribal Religion) প্রবর্তন ঘটে।

সমাজ-পরিবর্তনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপে, বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপজাতি যখন পরস্পর মিলিত হয়ে 'জাতি' গঠন করে তখন গোষ্ঠীধর্ম **'জাতীয় ধর্মে'** (National Religion) উন্নীত হয়। এই পর্যায়ে, গোষ্ঠীধর্মের বহু আত্মার প্রতি নৈতিক বিশেষণ আরোপ ক'রে মানুষ বহু দেবতার কল্পনা করে। এই পর্যায়ে প্রাকৃতিক আত্মাগুলিতে নরত্বধর্ম আরোপিত হয় অর্থাৎ তাদের মানবসুলভ গুণের (দোষেরও) অধিকারীরূপে গণ্য করা হয়। এই পর্যায়ের নরগুণসম্পন্ন জাতীয়-দেবতাদের কয়েকটি নাম করা গেল ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সুমের-এর (Sumer) ঈশ্‌তার, থেবিস-এর (Thebes) এ্যামন্, ইজরাইল-এর (Israel) জেওভা, মিশরের (Egypt) ওসিরিস্, গ্রীসের (Greece) জিউস্ এবং ভারতের বৈদিক নিসর্গ-দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি। নরসুলভ গুণের আরোপ করে মানুষ এইসব দেবতাদের এমনভাবে চিত্রিত করেছে যে তাদের মধ্যে কেবল পারস্পরিক ভালবাসা ও মৈত্রী ছিল না, হিংসা দ্বেষ এবং শত্রুতাও ছিল। প্রায় ৩,০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এটাই ছিল জাতীয় ধর্মের চিত্র।

খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত ধর্মের ক্ষেত্রটিকে এক **'সুবর্ণযুগ'** বলা হয়, কার্ল জেসপার্স যাকে Axial Period বলেছেন।'[১] এই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিছু সাধু-সন্তের আর্বিভাব হয়। তাঁরা প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে নীতিকে (morality) যুক্ত করে তার উৎকর্বসাধন করেন এবং **নীতিসম্মত ধর্মের বাণীকে** সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করেন। এই পর্যায়ের সূচনায় খ্রি. পূ. নবম শতাব্দীতে ইহুদী ধর্মপ্রচারক এলিজা (Elijah), আমোশ (Amos), হোসিয়ে (Hosea), খ্রি. পূ. অষ্টম শতাব্দীতে ইসাইয়া (Isaiah) এবং খ্রি. পূ. সপ্তম শতাব্দীতে জেরেমিয়া (Jeremiah) দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরের বাণী তাঁরা শ্রবণ করেছেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে মানুষের জীবনে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। এইসব ধর্মপ্রচারক তৎকালীন ইহুদী-ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নৈতিক ভাল-মন্দ যুক্ত করে **ধর্মকে অন্ধসংস্কার থেকে মুক্ত করেন, ধর্মকে নীতিনিষ্ঠ করেন**। পরবর্তীকালে, ৮০০ থেকে ৩০০ খ্রি, পূর্বাব্দে বিশ্বের নানা প্রান্তে এই প্রকারে ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষদের আর্বিভাব ঘটে — পারস্য দেশে জরাথুষ্ট্র (Zoraster), গ্রীসের পিথাগোরাস (Pythagoras), চীনদেশের কন্‌ফুসিয়াস (Confucius), ভারতের উপনীষদের মুনিঋষি, গৌতম বুদ্ধ, জৈন মহাবীর এবং ভাগবদ্‌গীতার রচয়িতা। ক্রমপর্যায়ে পরবর্তীকালীন দুটি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম এই 'সুবর্ণ যুগের' (Axial Period) ধর্মের দ্বারা, বিশেষ করে ঐ সময়ের ইহুদী ধর্মের দ্বারা বিশযভাবে প্রভাবিত হয়।

তবে উল্লেখযোগ্য যে, এইসব মহাপুরুষ প্রচারিত অভিমত প্রচারকালে সেসব তথাকথিত **'ধর্ম'** বা **'Religion'** নামে চিহ্নিত ও প্রচারিত হয়নি। বিভিন্ন ধর্মকে আজ যে সব নামে চিহ্নিত করা হয় (ব্যতিক্রম কেবল 'ইসলাম') তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের অবদান এবং পাশ্চাত্যের প্রভাবে এই প্রকারে নামকরণের পূর্বে, মানুষের মধ্যে ধর্মভেদ প্রকাশ পায়নি

এবং কোন মানুষ এমন প্রশ্নও করেনি যে 'এসবের (ধর্মের) মধ্যে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা?'[১] ডব্লিউ. সি. স্মিথও তাঁর The meaning and End of Religion গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে নবজ্ঞানোন্মেষের (Enlightenment) কাল থেকেই মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস, জীবনযাত্রা-প্রণালী ও আচরণবিধিকে বিভিন্ন নামে, 'খ্রিস্টানধর্ম', 'বৌদ্ধধর্ম', 'ইসলামধর্ম' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয় এবং তার পরবর্তীকাল থেকেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে— কোনটি সত্য, বৌদ্ধধর্ম অথবা খ্রিস্টধর্ম অথবা ইসলামধর্ম? তথা-কথিত ধর্ম সম্পর্কে এজাতীয় প্রশ্ন নেহাৎই অজ্ঞতাপ্রসূত। ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, **ধর্ম-বিশ্বাসের মূলে হল মানুষের অসহায়বোধ ও জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার প্রবল তাড়না; পরবর্তীকালে 'বেঁচে থাকার তাড়না' 'উন্নত** জীবনলাভের **বাসনায়' পরিণত হয়**। মানুষের স্বভাবেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে 'বেঁচে থাকার তাড়না' এবং 'উন্নত জীবনলাভের বাসনা'। মানুষের এই সহজাত তাড়না ও কামনা থেকেই মানুষ তার চারপাশের জগতে এক অতিমানবীয় শক্তিকে কল্পনা ক'রে তদনুসারে জীবনযাপন করতে চেয়েছে— কবি বা শিল্পী যেমন নিশ্চেতন জড় সত্তায় চিন্ময়সত্তা কল্পনা ক'রে জীবনকে সেইমতো যাপনযোগ্য করতে চায়। ধর্ম হল মানুষের বিশ্বাস এবং তদনুসারে জীবনযাত্রা প্রণালী, যার আচরণগতভাবে সামাজিক মূল্য থাকলেও যাকে 'সত্য' অথবা 'মিথ্যা' বল যায় না।